স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ

(পরিচয় পরিচিতি ঃ ১৯৩৬-১৯৮৭)

স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ-এর আবির্ভাব বিডন ষ্ট্রীটের আনন্দ আশ্রমে ২৩শে এপ্রিল ১৯৩৬ সালে, বৃহস্পতিবার প্রভাতে। তিথিটি ছিল পূণ্য অক্ষয় তৃতীয়া। আনন্দ আশ্রম, ২১/২ বিডন ষ্ট্রীট শুধু একটি বাড়ী নয়, এক পূণ্যধাম, বর্তমান কালে নাম-সংকীর্তনের অন্যতম পাদপীঠ। যেখানে ৫১ পীঠের সব পীঠ এসে মিলিত হয়েছে শ্যাম-শ্যামা মায়ের চরণতলে। যেখানে ৫১ বছর ধরে মহারাজের প্রকটলীলা; কতো মধুময় স্মৃতি এই বাড়ীটার ইঁট, কাঠ, ধুলায় মিশে আছে। সব আজও জীবন্ত স্মৃতি।

ঠাকুর শ্রীশ্রীবিশ্বনাথদেব ও মাতা শোভনাদেবীর মধ্যম পুত্র শিশির। জন্মলগ্নে নামকীর্তন চলছিল, শিশির যেন শ্যাম-শ্যামার চরণতলে নিবেদিত পুষ্পের ওপর শিশির বিন্দুর মতোই ক্ষণিকের স্থায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন, ধরা দিয়েই মিশে গেলেন প্রকৃতিতে, ভক্তের সাধনার সাধনায়।

মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শিশির ভট্টাচার্য, ডাক নাম শঙ্কু। মাতামহ ছিলেন ডাঃ সুধাংশু কুমার গুপ্ত। যাঁর কথা বলতে গেলে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কথা মনে পড়ে, যাঁর আহ্বানে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব, ঠিক তেমনই ডাক্তারবাবুর সাধনা এবং কৃপায় আপামর মানুষ পেয়েছিল শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেবকে এবং স্বামী

শিবানন্দ গিরি মহারাজকে। ছোট্ট মহারাজের বাল্যকাল সময়টা ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত। ১৩ বছর ধরে ঠাকুরের কীর্তন, পূজা, আনন্দধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকা। লীলার অংশ হয়ে থাকা, লীলায় মিশে থাকা।

শিশির ভট্টাচার্য পড়তেন রাণী ভবানী স্কুলে। স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গেও কীর্তন করতেন। মাত্র সাত বছর বয়স (১৯৪৩ সাল) থেকেই শ্রীখোল শিক্ষা শ্রীমদন দাসের কাছে। বাড়িতে হারমোনিয়ামে মায়ের বেদীর সামনে বসে সুরে সুরে নিজেকে তৈরী করা। মা শোভনা দেবীর সঙ্গে সঙ্গত করতেন কীর্তনের আসরে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে, স্কুলের বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে ঠাকুর ঘরে বসেই গান রচনা করেন, নিজেই সুর দিয়ে গেয়ে ওঠেন 'আর যাব না, আর যাব না ফিরাও তরণী...'।

স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক হিমাংশুবাবুর কাছে বসে চলতো গীতাপাঠ ও শাস্ত্রচর্চা। স্কুল জীবনে মাষ্টারমশাই কানাই বসুর প্রেরণায় বহু নাটক লিখেছেন। ১৯৫৪ সালে স্কুল ফাইনাল (ম্যাট্রিক) পাশ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজে B.Com পড়তেন। ১৯৫৮ সালে B.Com পাশ করেন। শিশির কলেজে বন্ধুদের নিয়ে কীর্তন করতেন। সেই কীর্তনে বন্ধুদের আকর্ষণ হওয়াটা তখন সবাইকার আশ্চর্য মনে হতো। কলেজে তাঁর লেখা 'ধর্মঘট' নাটক খুব আলোড়ন জাগিয়েছিল। উঁচু-নীচু সব ক্লাসের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা, সবার প্রিয় শিশির না হলে কলেজের কোন অনুষ্ঠানই জমতো না। আশ্চর্য, এর মধ্যেই কি ভাবে যে সবাইকে ভগবদ্ ভাবে বিভোর করে রাখতেন আর মাতিয়ে রাখতেন কীর্তন গানে।

সেই সময় কলেজের Cultural Wing থেকে একমাত্র Student Blazar পেয়েছেন নাটক লিখে ও কীর্তন করে। কলেজে পড়াকালীন মাথুর কীর্তন করেন প্রথমে রামমোহন লাইব্রেরী হলে ও পরে Indoor Stadium (Eden Garden)-এ। তখন বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ডঃ অচ্যুত কুমার দত্ত। তিনি শিশিরকে সবসময়েই উৎসাহ দিতেন এবং সাহায্য করতেন।

শিশির বরাবরই ছিলেন কিছুটা খেয়ালী এবং উদাসী স্বভাবের। 'হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনখানে' এই ভাবটি যেন তাঁর স্বভাবগত বা মজ্জাগত ছিল । বাড়ীতে গভীর রাত পর্য্যন্ত কীর্তন, নামগান, গান, নাটক রচনা, কীর্তন রচনা ও সুর দেওয়ায় কেটে যেত তাঁর বেশীর ভাগ সময়। এই সুর দেওয়ার সময় শ্রীগোপেন মল্লিক, শ্রীমতি অঞ্জলি মুখার্জীর সাহচর্য পেয়েছিলেন শিশির। এই সময় প্রায় ১৫টি নাটক লেখা ও অভিনীত হয়। পালা কীর্তন প্রথম রচনা করে পরিবেশন করেন সমর ঘোষ বলে এক বন্ধুর বাড়ীতে। তখন তিনি স্কুলে পড়েন। তাঁর প্রিয় গানগুলির মধ্যে একটি 'বৃন্দাবন বিহারী........খেলিছে কানু পিয়ারী' তখনকার রচনা। বড় বয়সে যখন কীর্তন অনুষ্ঠান হতো, তাতে তখনকার যুবসমাজ তাদের প্রাণপ্রিয় শিশির-এর সঙ্গী হতেন আর সঙ্গী হতেন বহু ভক্ত এবং গুণীজন। এই কীর্তন, নামগান করা ছেলেটির কোনও জিনিষের ওপর মোহ কখনও দেখা যায় নি। নিজের জামা-কাপড় প্রায়ই বিলিয়ে দিতেন। শীতের সম্বল একমাত্র কোর্টখানিও এক ভিখারিকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এই স্বভাবগত বৈরাগ্যের পরিচয় বোধহয় তাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে পরিচিত প্রায় সকলেই পেয়েছেন। চাকরী

জীবনের শুরু হয় A.G. Bengal -এ। তখন তিনি বাংলায় M.A. পাশ করে পুরোদমে শুরু করে দিয়েছেন Social Work.

সে সময় সর্বপ্রথম "Inter Office One Act Drama Competition"-এর কর্ণধার ছিলেন শিশির ভট্টাচার্য্য। শ্রীবিজয় লাহিড়ীর সঙ্গী। সেই Competition-এ State Bank, Cocacola, Grindlays Bank সহ বহুদল অংশগ্রহণ করে। সেই Competition-এর পুরস্কার বিতরণের দিন শ্রীশিশির ভট্টাচার্য রচিত শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বনাথদেবের লীলা-নাটক 'রূপের আড়ালে' অভিনীত হয়েছিল।

এর পরে শিশির এক বন্ধুর সঙ্গে 'সারদা রেডিও' নামে একটি দোকান করেন শিয়ালদহে। এই দোকানের স্মৃতি প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে মহারাজের একটি কথা খুব মনে পড়ছে। মহারাজ বলছেন, 'আমি যখন রেডিওর দোকানে বসে থাকতান, ওখান দিয়ে প্রায়ই যেতেন ঠাকুরের এক ভক্ত 'আড্ডিদা'। যাবার সময়ে রোজই উনি আমায় বলে যেতেন, 'তুমি কি এইজন্যে এসেছ?' এই একটি কথাই রোজ বলতেন (পরবর্তী কালে স্বামী শিবানন্দ গিরি রূপে তাঁর প্রকাশে এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়)। সরস্বতী প্রেস-এ কিছুদিন ম্যানেজারের কাজ করেন, ১৯৬৯-৭০ নাগাদ। সেখানে সরস্বতী প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশৈলেন গুহরায়-এর ঘরে কীর্তনের আসর বসতো।

ধর্মক্ষেত্র কর্মক্ষেত্র একাকার। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে বার বার উল্লেখ করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদা মায়ের কথা বলতে বলতে বিভোর হয়ে

যেতেন। বারবার বলতেন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত আমার Dictionary'। তাঁর মানুষের ঘরে ঘরে যাওয়া, সকলকে ভালবেসে কাছে টেনে নেওয়া, ভগবৎ-ভাবে উদ্বুদ্ধ করা এ যেন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচন্ডালে প্রেম বিতরণ স্মরণ করিয়ে দেয়। উপার্জন করতেন কিন্তু তার ভাগ কোনদিন বাড়িতে এসে পৌঁছত না। দুঃখী, আতুর মানুষদের সেবায় প্রায় সবটুকুই খরচ হয়ে যেত।

১৯৬৮ সাল নাগাদ শিশির বিবাহ করেন এবং বিবাহের কিছুদিন পর তিনি হাওড়ার নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত বাড়ীতে বসবাস করতে থাকেন। এই বাড়ীতেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বনাথ মিশন স্কুল ও কলেজ। নানা কারণে কলেজটি বন্ধ হয়ে গেলেও স্কুলটি এখনও চলছে। নানাভাবে নানাকাজে নিজেকে যুক্ত রাখলেও তিনি বিভিন্ন জায়গায় নাম সংকীর্তন ও লীলা কীর্তনের প্রচার করতেন। আনন্দ আশ্রমে প্রতি শনিবারের কীর্তনে এবং নানা উৎসবে তিনিই ছিলেন সকলের আনন্দের উৎস।

১৯৭২ সালের আগস্ট মাস। এলো সেই ডাক, সেই আকর্ষণ, সেই চিরসুন্দর আনন্দময়ের হাতছানিতে আনন্দময় শিশির বেড়িয়ে পড়লেন পথে। পিছনে পড়ে রইল তাঁর কর্মজগৎ, তাঁর সংসার, স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়বন্ধুজন। এক ভিন্ন পথ, এক ভিন্ন জীবন। চললেন হিমালয়ের পথে পথে — বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, হৃষিকেশ, হরিদ্বার — শিশিরবিন্দুর রূপান্তর শিবানন্দ রূপে। ভোলাগিরি সন্ন্যাস আশ্রমে স্বামী অসীমানন্দ গিরি মহারাজের কাছে গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ। চলা তাঁর থামল না, পথকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়লেন, এবারে সঙ্গী হলেন নাগা সন্ন্যাসীরা। তাঁদের সঙ্গে বনে, পাহাড়ে, তীর্থে

তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। ভালবাসলেন তাঁদের । ভরে উঠলো তাঁর ঝুলি, খুঁজে পেলেন পথ, গান গেয়ে উঠলেন — 'আমার মন বলেছে এই পথে চলে গেছে শ্যাম''। চললেন পশ্চিম ভারতে গিরনার পাহাড়ের তীর্থে তীর্থে।

চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর টান পড়লো অন্তরের অন্তঃস্থলে। মনে হোল 'খোঁজ যারে সেই তো ঘরে তোমারই দিন গুনি।' তিনি অনুভব করলেন, যাঁর কৃপায় তার জীবন, যাঁর উপস্থিতি তার প্রতিটি রক্তবিন্দুতে, সেই ঠাকুর আমার সঙ্গে আছেন। ভালোমন্দ দুই দেখাচ্ছেন। মনে হোল তাঁকে কাছে পেয়েও তার অনন্ত রূপের কতটুকু জেনেছি। পৃথিবীর যত আনন্দ সেকি তাঁর আনন্দধামেই লুকিয়ে রেখেছিলেন? তাঁর মনে হোল আমার ক্রমিক বিভ্রান্তি আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। আগুনের উৎস থেকে আমি নিজেই সরে ছিলাম। কিন্তু তিনি আমায় ছাড়লেন না। সব রকমের 'ভোগ' এবং 'ভোগান্তি' দিয়ে পথে বার করে দিলেন। বললেন, 'মূর্খ তুই যাবি কোথায়, সমস্ত পৃথিবীটাই যে সূর্যের আকর্ষণে সূর্যের চারি পাশে ঘুরছে। রাত্রি যত বড়ই হোক আবার সূর্যোদয় হবেই।'

অতঃপর ১৯৭২ সালের কালীপূজার মধ্যরাত্রে আনন্দ আশ্রমে শ্যাম-শ্যামার অঙ্গনে আবার দেখা দিলেন। সকলে মাতোয়ারা তাঁর সেই রূপে। আবার কীর্তন, আবার সেই বাঁধনহারা আনন্দ। 'ভোলানাথ পঞ্চমুখে গায় / সেই হরিনাম গঙ্গা হয়ে / দিকে দিকে ধায়।'

শিশির ভট্টাচার্য রূপান্তরিত হলেন স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ-এ। অথবা শুধু 'মহারাজ'-এ। ঘরে ঘরে, মন্দিরে, আশ্রমে,

দেশে বিদেশে চলল বিরামহীন নাম বিতরণ। শুধু নাম সংকীর্তন, শুধু ঈশ্বর প্রসঙ্গ। ক্লান্তিহীন, সদা আনন্দময় মহারাজের সংস্পর্শে এসে মানুষ ফিরে পেল তার নিজের ঘর, তার প্রাণের আরাম, তার মনের আনন্দ। নদীয়ালীলার পুনরাবৃত্তি হল শহর কলকাতার বুকে। সকল সম্প্রদায়ের সকল মানুষের মিলনভূমি প্রস্তুত করতে, অশেষ উদ্যমে, অসীম ভালবাসায়, তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধিতে, সর্বোপরি ঈশ্বরীয় উদারতায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন মহারাজ। ‘যত মত তত পথে’-র ভগবানের লীলাভুমি দক্ষিণেশ্বরে শুরু করলেন ‘নিখিলবঙ্গ ভক্তিগীতি সম্মেলন।’ উদ্দেশ্য ভক্তিমূলক সঙ্গীতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। ভগবানের গানকে ঠাকুর ঘর থেকে অন্দর মহলে প্রবেশ করানো, দেশের যুবসমাজকে ভগবৎ প্রসঙ্গে আগ্রহী করা, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতাবলম্বী মানুষকে একই মঞ্চে সমবেত করা।

১৯৭৮ সালে শুরু হল নিখিল বঙ্গ ভক্তিগীতি সম্মেলন। সমগ্র পশ্চিম বাংলার মানুষ আগ্রহী হয়ে জড়ো হল এই সম্মেলনে। এলেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়, এলেন শিখ সম্প্রদায়, এলেন খ্রীষ্টান, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রচারকেরা। একের উদ্দেশ্যে একই মঞ্চে, এক সাথে সবাই এক হলেন। সারা বাংলার সঙ্গীত শিল্পীমহল এগিয়ে এলেন, এগিয়ে এলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক মানুষেরা। স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ এমন এক মিলনভূমি রচনা করলেন যেখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এসে ভাবতে পারল এটা আমারই জায়গা। মহারাজ বললেন, ‘সকলে নিজের গুরুর নামে জয়ধ্বনি না দিয়ে বল জয় শ্রীগুরুর জয়, তাহলেই দেখবে তুমি নিজের গুরুকে যেমন সম্মান দিচ্ছ তেমনই সকল গুরুকেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছ’।

১৯৭৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। প্রথমবারের ভক্তিগীতি শেষ হবার পর মহারাজ এদিন সকল শিল্পী ও ভক্তদের নিয়ে মিলিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে। উদ্দেশ্য সকলে মিলে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করা। সবাই মিলে আনন্দ করে প্রসাদ পেলাম। এর পরে যে ঘটনাটি ঘটল তা শুধু মহারাজেরই নয় আমাদের সকলের জীবনেরই এক বিশেষ ঘটনা। মহারাজের প্রিয় সন্তানদের মধ্যে যে সন্তানটি তার নিষ্ঠা, সেবা ও ভক্তি দিয়ে মহারাজের কাছের জায়গাটি দখল করেছিল সেই কৈলাস ঘোষ ঐ দিন অনুষ্ঠান শেষে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে বিলীন হয়ে যায় গঙ্গায়। প্রিয় কৈলাসকে হারিয়ে মহারাজ স্তব্ধ হয়ে যান ব্যথায়, বেদনায় এবং আত্মবিশ্লেষণে। তিনি খুঁজে নেন তাঁর কৈলাসকে সমস্ত মানুষের মধ্যে। দীন, দুঃখী, অবহেলিতের মাঝে তিনি ফিরে পান তার কৈলাসকে। 'মূর্খ দেবো ভব, দরিদ্র দেবো ভব' স্বামীজীর এই বাণীর মধ্যে তিনি যোগ করেন 'অবহেলিত দেবো ভব'। তিনি গড়ে তোলেন 'কৈলাস'। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আনন্দ, তাঁর ব্যথা, তাঁর ভালবাসা, তাঁর সহমর্মিতা। তাঁর সকল ভাবনার রূপ দেন 'কৈলাস'-এ। 'কৈলাস'-কে সঙ্গে নিয়ে তিনি গিয়ে দাঁড়ান দীন দুঃখী অবহেলিত মানুষের পাশে। তিনি একদিকে যেমন কীর্তন, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং অনুভব অকাতরে বিতরণের মধ্য দিয়ে দেশে বিদেশে এক আন্দোলনের ঢেউ তোলেন, যেখানে সকল সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে সকল ধর্ম, সকল মত, সকল ইষ্টের মিলনভূমি রচনা করে এক মিলন ক্ষেত্র রচনা করেন। আবার অপর দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন অনাথ, অবহেলিতের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবাকাজের মধ্য দিয়ে শ্রীভগবানের পূজা করা। যে মহারাজ

একদিন ভেবেছিলেন আমরা নিজেদের পয়সা থেকেই চালিয়ে যাব কীর্তন-পূজার কাজ, চাঁদার বিল নিয়ে কোনদিন লোকের কাছে যাব না, তিনিই সন্তানের বিয়োগ বেদনায় গড়ে তোলেন 'কৈলাস" - অবহেলিতের আশ্রয়'। একে একে গড়ে তোলেন বিবেকানন্দ স্নেহনীড়, সারদামণি স্নেহনীড়, নিতাই সেন সানডে ক্লিনিক, ডঃ সুধাংশু কুমার গুপ্ত মেমোরিয়াল ক্লিনিক, ডঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি নানা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এরই মধ্যে বিরামহীন ভাবে তিনি সনাতন ধর্মের ধারক ও বাহকরূপে দেশের এবং বিদেশের মানুষদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এক উদার মানসিকতায়, সংকীর্ণতার গণ্ডী পেরিয়ে প্রকৃত মানবিকতার ভূমিতে যেখানে আমাদের মন্ত্রে উচ্চারিত হয় বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা, সামগ্রিক শান্তির বার্তা। উচ্চারিত হল তাঁর কণ্ঠে—

'My ship is little, your sea is wide
Be my friend, be my guide.
My wings are little, your sky is high
Be my friend, be my guide.'

১৮৮২-র ২৬শে ফেব্রুয়ারীর শুভ দিনটিতে শ্রীম-র (মাষ্টারমশাই, শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ, প্রথম দর্শন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে। অধ্যাত্মতত্ত্ব ইতিহাসের ঐ পবিত্রতম গৌরবময় দিনক্ষণ আর মুহূর্তটিকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখবার জন্য, সর্বোপরি আচার্য্য ঋণ স্বীকার করার জন্য, স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ ঠিক ১০০ বছর পর অর্থাৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২-তে রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি নাটমন্দিরের পশ্চিমদিকের অংশ চিত্রপটে সুসজ্জিত এক বিস্তৃত মঞ্চ নির্মাণ

করালেন। সূচনা হল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত শতবার্ষিকী' অনুষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ, স্বামী গহনানন্দ মহারাজ প্রমুখ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সাধু মহারাজ, গুরুজনদের সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। এলেন সহস্র রামকৃষ্ণ অনুরাগী ভক্তবৃন্দ। এখানে একটি কথা না বললেই নয়, সেটা হল রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী বলেন, যে অনুষ্ঠানটি রামকৃষ্ণ মিশনের করার কথা ছিল সে অনুষ্ঠান স্বামী শিবানন্দজী সুন্দরভাবে সংঘটিত করে আমাদের সকলকে ধন্য করেছেন।

১৯৮২ সাল ১৫ থেকে ২১শে মার্চ রবীন্দ্র সরোবরের মুক্তমঞ্চে সপ্তাহব্যাপি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হয়। এরপরে নিখিল বঙ্গ ভক্তিগীতি সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিকী অধিবেশন চলতে থাকে।

১৯৮৩ সালের ১লা জানুয়ারি কল্পতরু উৎসবের দিন কপিরাইটের বেড়া ডিঙিয়ে দশটি প্রকাশক পাল্লা দিয়ে সুলভ মূল্যে কথামৃতের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করলেন। '৮৩-র শতবার্ষিকী উৎসব এখানেই সার্থক।

১৯৮৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি, অষ্টম বর্ষের নিখিল বঙ্গ ভক্তিগীতি সম্মেলন শুরু হল দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫০০-তম জন্মজয়ন্তীকে স্বাগত জানিয়ে। প্রথমদিন সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে 'অস্পৃশ্যতা দূর হোক' *Good Bye to Untouchability* — এই প্রার্থনা নিয়ে ভারতের বিশ্ববিখ্যাত সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত পণ্ডিত রবিশঙ্কর জানালেন শ্রদ্ধাঞ্জলি। সুরাঞ্জলি। প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত। ব্যারিকেড নেই,

ভলেন্টিয়ার নেই। শান্ত সমাহিত ‘এক মন্দির জনতা’। স্বয়ং পণ্ডিতজী বলে গেলেন ‘আমার জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এত বড় শ্রোতৃমন্ডলী আর পাইনি।’ যুগান্তর লিখেছেন — ‘১৮৫১ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৩৬ বছরে একটা ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে রইল।’ ‘আজকাল’-এর আয়নায় লিখেছেন — ‘কুষ্ঠ রোগী কম্বল মুড়ি দিয়ে বাজনা শুনছেন। মায়ের মন্দিরে অবারিত দ্বার নইলে ওদের কে ঢুকতে দেবে রবিশঙ্করের অভিজাত সুরের আসরে?’

এই সময় ‘চৈতন্য চকড়া’ আবিষ্কার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। চকড়া অর্থাৎ বাংলায় কড়চা বা দিনলিপি। প্রাচীন কবি শ্রীল গোবিন্দদাস বাবাজী বিরচিত ওড়িয়া ভাষায় মহাপ্রভুর পুরীধামে অবস্থানকালীন নানা ঘটনার বিবরণ যা পুঁথি আকারে পাওয়া যায়। পদ্মশ্রী সদাশিব রথশর্মার (গবেষক, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, পুরী) সহায়তায় স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ এই প্রাচীন পুঁথিটির বাংলায় তর্জমা করে ‘চৈতন্য চকড়া’ গ্রন্থটি ‘কৈলাস’-এর তরফ থেকে প্রকাশ করেন। এর আগে মহারাজ কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সামনে এই পুঁথিটির প্রাপ্তি ও ঐতিহাসিক মূল্য ব্যাখ্যা করেন। পরে প্রতিটি দৈনিক কাগজে এর প্রতিবেদন বের হয় ও বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পরবর্তীকালে মহারাজ ভক্তিগীতি সম্মেলনকে পুরী এবং বোম্বাইয়েও অনুষ্ঠিত করেন। এই সময়ে ভক্তিগীতি প্রচারের জন্য “Critic Circle of India” সি. সি. আই পুরস্কারে সম্মানিত করেন এবং এই পুরস্কারটি দিল্লীতে কামানি হলে মহারাজের হাতে তুলে দেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। বর্তমানে

মহারাজের শারীরিক অনুপস্থিতিতে এখনও মহারাজের কয়েকটি কাজ তার সন্তানেরা সুষ্ঠভাবে করে চলেছে।

১৯৮৬ সালের ১৯শে মার্চ। হরিদ্বার। শ্রীশ্রীভোলগিরি আশ্রমে মহারাজের মহামণ্ডলেশ্বর পদে অভিষেক। সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বরবৃন্দ, সাধু-সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তের উপস্থিতিতে পূজা, হোম, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরু হয়। পরিশেষে বৃহৎ সাধু-ভাণ্ডারার আয়োজন ছিল।

১৯৮৬ সাল। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫০০তম আবির্ভাব পূর্তি উৎসব উপলক্ষে হরিদ্বারের পথে পথে মহাপ্রভুর বিরাট চিত্রপট সহযোগে মহারাজ ঐতিহাসিক নগর সংকীর্তনের আয়োজন করেছিলেন। 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র'-এ মুখরিত হরিদ্বারের আকাশ বাতাস, অগণিত মানুষের যোগদানে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। প্রসঙ্গত সেইসময় কুম্ভমেলায় মহারাজ একটি সচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে মহারাজের প্রিয় শিল্পী, শ্রী মানব দেবের হাতে আঁকা বড় বড় চিত্রে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী ফুটে উঠেছিল। এই প্রদর্শনীও এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে রইল।

মহারাজের জীবন লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই চিরদিনই তাঁর কাজের পরিধি সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে এবং বিভিন্ন বৈচিত্রে তাঁর চিন্তাধারা মানুষকে এক অভিনব আনন্দ আস্বাদনে রসদ যোগাত। তাঁর উপস্থিতিই এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করত যে মানুষ তার মনুষ্যত্ব, আনন্দের ছোঁয়া পেয়ে নতুনভাবে বাঁচবার পথ খুঁজে পেত। একটা আনন্দ বিচ্ছুরিত হতো। নিজের সুখ, নিজের

আরাম তুচ্ছ করে মানুষের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

এতো কর্মধারায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখে আপন শরীরটার দিকে তাকাবার তাঁর ফুরসৎ ছিল না। তাঁর ডিকসনারীতে বিশ্রাম বা অবসর শব্দগুলির কোনো স্থান ছিল না তাই শরীরের দিকে না তাকিয়ে সমাজ ও মানুষের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মাত্র ৫১ বছর বয়সে তিনি একেবারে বিশ্রাম নিলেন।

১৯৮৭ সালের ৫ই আগষ্ট, ঝুলন একাদশী তিথিতে তিনি অপ্রকট হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের চিরন্তন লীলায়। তিনি রয়ে গেলেন আমাদের সকল চেতনায়, সকল ধ্যানে, সকল পূজায়, সকল কর্মে। তাই আজও আমাদের পূজা চলেছে তাঁকে স্মরণে জাগ্রত রেখে তাঁর কাজগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায়।

দীনবন্ধু অতি সুমধুর বচনম্।
সুরলোক বন্দিত কীর্তন বিলাসম্।
প্রেমমূরতি সদা ক্লেশ নিবারণম্।
স্ফূরতি শ্রীরাধামাধব দর্শন মাত্রম্।
শিবানন্দ রূপম্ অতিশয় মধুরম্।
জনম জনম তব শ্রীপদ স্মরণম্।।

অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়